ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1380-1389
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.358

উত্তর-ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর জেলা: কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষি কাঠামো (১৯৪৭-১৯৫৫)

রাজকুমার মন্ডল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the colonial era, in marked contrast to the industrialised districts of Howrah, Hooghly, and 24 Parganas situated along the banks of the Ganges, the district of Medinipur experienced no significant development of large-scale industries; consequently, agriculture emerged as the primary subsistence source of livelihood for seventy six percent of the district's population. The agrarian structure that evolved during this period which revolved primarily around land fostered relationships of subordination and subservience within the social fabric. However, from the 1930s onward, as the intensity of exploitation perpetrated under the guise of debt and revenue collection gradually escalated, resentment began to simmer among small farmers, sharecroppers, and the landless classes against the jotedars-zamindars and moneylenders; in due course, this very resentment gave rise to a distinct form of 'class consciousness' within the political sphere. However, paddy constitutes the principal crop of Medinipur district, the present study which focuses primarily on paddy production of the post-colonial Medinipur, endeavors to move beyond the confines of a unidimensional analysis based solely on a linear correlation between land area and production volume. Instead, drawing upon statistical data, this research attempts to analyze a complex web of interrelationships; specifically, it examines in detail the relationship between production levels and the district's population density; the manner in which 'technological' and 'institutional' frameworks influenced production; how the agrarian-social structure of rural areas maintained its control over these technological and institutional frameworks; and how 'market-driven commercial' forces exerted control over both the processes of production and distribution.

Keywords: Regional History, Agrarian structure, Agricultural production system.

মেদিনীপুর জেলাটি অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় আয়তনে বৃহত্তম। ১৯৪৯ সালের সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এই জেলার আয়তন ৫২৭৪ বর্গ মাইল যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ১৮.৬৯% এলাকা জুড়ে এই জেলার অবস্থান।[১] উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের সীমান্তে মেদিনীপুর জেলাটি অবস্থিত হওয়ায় একদিকে আর্য সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে।[২] এছাড়াও জেলাটির অবস্থান উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তভাগে হওয়ায় এই অঞ্চলের সমাজজীবনে ওড়িয়া এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতির নিজস্ব ধারার সমন্বয়ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি বহন করে চলেছে; এই দুই সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী-জনজাতি সংস্কৃতির নিজস্ব ধারারও মেলবন্ধন ঘটেছে।[৩] মেদিনীপুরের উত্তর ও পশ্চিমাংশে সাঁওতাল জাতির অবস্থান সবচেয়ে বেশি;

সভ্যতার গোড়াপত্তনের সময় থেকে আদিবাসী জনজাতিগুলি এই অঞ্চলে পাথর নির্মিত হাতিয়ার দ্বারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের জীবনধারা গড়ে তুলেছে।[৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঝাড়গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে বিনপুর, শিলদা ও উত্তর-পূর্বে লালগড়, রামগড় এবং গড়বেতার দক্ষিণে শালবনি ও মেদিনীপুর শহরের ভেতর দিয়ে ঝাড়গ্রামেরর দক্ষিনে গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রামের দিকে সুবর্ণরেখার ধার বরাবর জঙ্গলগুলি পরিস্কার করে সাঁওতাল সহ অন্যান্য জনজাতিগুলি এই উর্বর অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।[৫] এই জেলাটিতে *'জঙ্গল-উপকূল-সমুদ্র'* এই তিনটি প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয় যা পশ্চিমবঙ্গের স্বতন্ত্র ব্যতিক্রমী জেলা হিসেবে পরিচয় বহন করে।

এই জেলার জলবায়ু মিশ্র প্রকৃতির; উত্তর-পশ্চিমাংশে জলবায়ু শুষ্ক প্রকৃতির এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশের জলবায়ু আর্দ্র হওয়ায় উত্তর-পশ্চিমাংশের তুলনায় এখানে ধানের উৎপাদন বেশি হয়। ধান(প্রধান ফসল) ছাড়াও অন্যান্য কৃষিজ ফসল যেমন ডাল, তেল, আখ, তামাক, পান, আলু, ফুলের চাষ প্রভৃতি হয়ে থাকে। তবে কৃষি প্রধান জেলা হলেও ঝড় ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে প্রচুর পরিমাণে শস্যহানি ঘটে। ১৯৪৭-৫৫ সালের মধ্যে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩৬৮.৩ মি.মি. এবং গড় তাপমাত্রা ২৬° সে.; গড় বৃষ্টিপাতের থেকে ১৯৪৮ সালে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১৫৯২.৬ মি.মি. এবং ১৯৫৪ সালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১০০২.৮ মি.মি.।[৬] তবে এই সময়কালে সার্বিকভাবে জেলার কৃষি অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব তেমনভাবে পড়েনি।

সামাজিক ক্ষেত্রে এই জেলায় মধ্যবর্ণ এবং তপশীল জাতি ও জনজাতির মানুষের বসবাস বেশি। ১৯৩১ সালে এই জেলায় ৬.৩১% উচ্চবর্ণ, ৫৮.১৭% মধ্যবর্ণ, ১৯.১৫% তপশীলী জাতি, ৮.৫৪% জনজাতি ও মুসলিম ৭.৫৯% বসবাস করে; মোট জনসংখ্যার ৩১.৫৬% মাহিষ্য জাতি বসবাস করে।[৭] এই জেলার পশ্চিমাংশে তপশীলী জাতি ও জনজাতির আধিক্য বেশি এবং পূর্বাংশে মধ্যবর্ণ শ্রেণির মধ্যে মাহিষ্যদের আধিক্য বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই জাতি 'জেলে কৈবর্ত্য' থেকে 'চাষা কৈবর্ত্য'[৮] হিসেবে স্বতন্ত্র হয়ে 'মাহিষ্য জাতি' হিসেবে সামাজিকভাবে পরিচিতি লাভের মধ্যদিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ঔপনিবেশিক পর্বের বিংশ শতকের কুড়ির দশক থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়কালেও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে এই মাহিষ্য জাতির প্রভাব অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় বেশি।

আলোচ্য সন্দর্ভে ১৯৪৭ ও ১৯৫৫ সালটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে কয়েকটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ 'অধীনতা' থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে; এই স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভাজনের পাশাপাশি ভূখন্ড ও নাগরিকদেরও বিভাজন হয়েছিল। তবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেমন পুলিশ, প্রশাসন, আইন(ভারতীয় দন্ডবিধি), আদালত, সেনাবাহিনীর কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্ণগত-শ্রেণিগতভাবে প্রান্তিক স্তরের মানুষদের দীর্ঘদিনের লাঞ্ছিত দাবিগুলি পূরণের নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। এই সময়কাল থেকে মেদিনীপুর জেলায় 'নির্বাচনী' এবং 'বৈপ্লবিক' ধারার রাজনীতি নতুন আঙ্গিকে শুরু হয়েছিল; কৃষি কাঠামোয় জোতদার-জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র রায়ত-ভাগচাষি ও ভূমিহীন শ্রেণির প্রতিরোধ আন্দোলন বামপন্থী দলের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিকভাবে গড়ে ওঠে।[৯] প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়(১৯৫১-৫৬) কৃষি ব্যবস্থা থেকে 'মধ্যস্বত্বভোগী' শ্রেণির উচ্ছেদ ঘটিয়ে শোষনের সমস্ত রকমের কৌশলকে সরিয়ে গ্রামীণ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে 'কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের' *(tillers of the soil)* নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং রাজ্যগুলিকে তা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়।[১০] এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সালে "পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন" প্রণয়নের দ্বারা কৃষি ব্যবস্থায় সরকার ও কৃষকদের মধ্য থেকে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উচ্ছেদ ঘটিয়ে কৃষকদের জমির অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়; জমি হস্তান্তর বা

উপ-ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য জনপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা*(Ceiling)* নির্ধারণ করা হয়।[১১]

জমির ধরণ:

জমির প্রকৃতি ফসল উৎপাদনে প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং মৌলিক গুরুত্বের দিক থেকে মেদিনীপুর জেলার কৃষিজ ফসল উৎপাদনে কর্ষণ যোগ্য জমি মূলত তিন প্রকার। যথা- উচ্চ ভূমি, নিম্ন ভূমি ও পলি ভূমি(দায়রা জমি)।[১২] উচ্চ ভূমিতে রবি শস্য ভালো হয়। এই জমি বাস্তু ও ধোসা(বর্ষাকালে আউস ধান রোপণ করা হয় এবং শীতকালে ডাল ও তৈল শস্য উৎপাদন হয়) নামে উপ বিভাগে বিভক্ত। নিম্ন ভূমিকে জলাভূমি বলা হয়। এই জমি ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। পলি ভূমি যা নদীর পার্শ্ববর্তী জমিকে বোঝায়। এই জমি খুবই উর্বর এবং রবি শস্য, ডাল, তৈল শস্য, গম, বার্লি ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জীর চাষ ভালো পরিমাণে হয়ে থাকে। তবে কন্টাই ও তমলুক মহকুমায় কর্ষণ যোগ্য জমিকে 'মধুর' জমি এবং লবনযুক্ত জমিকে 'নিমক' বলে।[১৩]

কৃষি অর্থনীতি:

মেদিনীপুর জেলার 'Survey and Settlement Report(1911-17)'-এ পতিত জমি ব্যতীত 'চাষযোগ্য পতিত জমি'র পরিমাণ ৬১৯.৫ হাজার একর এবং 'চাষ অযোগ্য জমি'র পরিমাণ ৫৩৩.০ হাজার একর।[১৪] ১৯১৭ সালের সেটেলমেন্ট রিপোর্টে এও উল্লেখিত হয় যে, ধানের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আখ চাষের জমিতে ধান চাষ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৫] কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালে ইশাক রিপোর্টে ২৮৮.৪ হাজার একর কমে গিয়ে পতিত জমি ব্যতীত 'চাষযোগ্য পতিত জমি'র পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩১.১ হাজার একর এবং 'চাষ অযোগ্য জমি'র পরিমাণ ৫৯৭.৬ হাজার একর।[১৬] জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এই জমিগুলি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। আবার অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জলপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ এবং সর্বোপরি ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা ও জনসেবার কারণে রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং ঘুর্ণিঝড়ে সমুদ্রের নোনা জল জমিতে প্রবেশ করার ফলে(বিশেষত কাঁথি ও তমলুক মহকুমায়) 'চাষ অযোগ্য জমি'র পরিমাণও ৬৪.৬ হাজার একর বৃদ্ধি পায়।[১৭] তবে এই জেলার মাটির উর্বরতা এবং বৃষ্টিপাতের ধরণ অনুযায়ী আউস ও বোরো ধানের জমির তুলনায় আমন ধানের জমিতে বেশি পরিমাণ চাষ হয়।[১৮] চাষের ক্ষেত্রে কোনো আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার না হওয়ায় অর্থাৎ উন্নতমানের বীজ ধানের ব্যবহার, জলসেচ ব্যবস্থার অভাব এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সারের যোগানের অভাবে এইসব জমিতে বছরে একবার ফসল হয়ে থাকে; মাত্র ৬.৬৩ শতাংশ জমিতে দুইবার চাষ হত।[১৯] তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একর প্রতি ফসল উৎপাদনের পরিমাণ না বৃদ্ধি ঘটলেও জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের উপযুক্ত জমি তৈরি করায় মোটামুটিভাবে ফসল উৎপাদনের পরিমাণে ভারসাম্য বজায় ছিল।

স্বাধীনতার পর মেদিনীপুরে কৃষি ক্ষেত্রে প্রকৃত চাষবাদের জমির পরিমাণ এবং প্রধান কৃষিজ ফসল ধান উৎপাদনে কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল? জনঘনত্বের চাপ উৎপাদনকে বাড়িয়েছে নাকি কমিয়েছে? প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত কাঠামো(সেচ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি) কৃষি অর্থনীতির রূপান্তরে কতটা সহায়ক ছিল? এক্ষেত্রে শ্রম বাজারের কি ভূমিকা ছিল? ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে মেদিনীপুরে মোট জমির(৩৩৬১.৮ হাজার একক) গড়ে ৬৬.৮১ শতাংশ জমি 'প্রকৃত চাষাবাদে'র জমিতে কৃষিকাজ হয়েছিল; এর মধ্যে প্রথম পাঁচ বছর(১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৫০-৫১) 'প্রকৃত চাষাবাদে'র জমির পরিমাণ ছিল গড়ে ৬৭.৪৪%; পরের পাঁচ বছরে(১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬) প্রকৃত চাষাবাদের জমির পরিমাণ ১.২৭% হ্রাস পেয়ে হয় ৬৬.১৭%; প্রথম

পাঁচ বছরে পতিত জমির পরিমাণ ছিল ৩.৪৯%, তা ৩.১৩% বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পাঁচ বছরে পতিত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬.৬২%।[২০] এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এই সময়কালে সরকার সমস্ত জমিকে অধিগ্রহণ করে। এরফলে ভাগচাষীরা যাতে জমির ওপর স্বত্ত্বাধিকারনা পায় সেকারণে জোতের মালিক নিজেদের জমি চাষ করে মজুর দিয়ে ; সুতরাং বিশাল পরিমাণ জমি একজন মালিকের পক্ষে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জমি চাষ করতে দেওয়ার একটি 'সামাজিক সম্পর্ক' ছিল বলে অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ সেন দাবী করেন। তিনি বলেন মালিক সেইসব পরিবারকে জমি চাষ করতে দিতেন যাদের শ্রম দেওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকতো, এতে ফলন বেশি উৎপন্ন হতো এবং মালিক লাভবান হতো। কিন্তু এই সময় জমির উৎপাদনের উপর অধিকার নিয়ে যে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল তার ফলে সরকার ভগচাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ রদ করে এবং ফসলের ওপর তিন ভাগের এক ভাগ প্রদানের ব্যাপারে সুনিশ্চিত করে। এখানকার প্রধান ফসল ধান; ১৯৪৭-৫৫ সালের মধ্যে মোট এখানকার চাষের জমির পরিমাণ গড়ে ২০৭৫ হাজার একর; যা প্রথম পাঁচ বছরে গড় ধান চাষের জমির পরিমাণ ৬২,৩৫%; পরের পাঁচ বছরে(১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬) এই পরিমাণ প্রথম পাঁচ বছরের থেকে গড়ে ১.২৬% হ্রাস পায়; কিন্তু এই সময়কালে মোট চাষের জমিতে আমন ধানের জমির পরিমাণ গড়ে ৮৯.৪৩% হলেও তুলনামূলকভাবে আউস ও বোরো ধানের জমির পরিমাণ ছিল গড়ে যথাক্রমে ৫.৯৭% এবং ০.৩২%;।[২১] বোরো ধানের জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন ; তাই পর্যাপ্ত জলসেচের ব্যবস্থা না থাকায় এই চাষ বাড়ানো সম্ভব হয়নি। প্রথম পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট পরিকল্পিত বাজেটের ১৭. ৪% টাকা কৃষি ও জনউন্নয়নে এবং ২৭. ২% টাকা সেচ ও শক্তির জন্য বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু মেদিনীপুর জেলায় সরকারী প্রকল্পের থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ বেশি হয়ে থাকে। প্রথম পাঁচ বছরের(গড়ে ৮৫.২৩%) থেকে পরের পাঁচ বছরে(গড়ে ৯৩.৬৪%) আমন ধানের জমির পরিমাণ গড়ে ৮.৪১% বৃদ্ধি পায়; তবে আউস ও বোরো ধানের জমির পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি পায়নি, যথাক্রমে গড়ে ০.০৭% ও ০.০৫% হারে বৃদ্ধি হয়।[২২] জলসেচের সম্ভাবনা থাকলেও উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে এই জেলায় তেমন আশানুরূপ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেনি। এই সময়কালে গড়ে ৫.৬২% জমিতে একবারের বেশি চাষাবাদ হত।[২৩] একটি আশ্চর্যজনক পরিসংখ্যান হলো বছরে একই জমিতে একাধিকবার ফসলের জমির পরিমান প্রথম পাঁচ বছরের(৫,৫৮%) তুলনায় শেষ পাঁচ বছরে(৫.৬৬%)মাত্র ০.০৮% বৃদ্ধি ঘটেছে। ধান চাষের জমির পরিমাণ কমলেও মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়কালে প্রতি বছর গড়ে ৮০৩.৭৩ হাজার মেট্রিক টন মোট ধান উৎপন্ন হয়; যার মধ্যে আমন ধান প্রতি বছর গড়ে ৭৬৬.৫৮ হাজার মেট্রিক টন উৎপন্ন হয় এবং আউস ও বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে প্রতি বছর গড়ে ৩৪.৮৪ হাজার মেট্রিক টন ও ২.৩১ হাজার মেট্রিক টন।[২৪] প্রথম পাঁচ বছরের থেকে শেষ পাঁচ বছরের ধান উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমান গড়ে ৩.০৬%; আমন ধানের বৃদ্ধির পরিমান মাত্র ০.৩৮%; কিন্তু আউস ধানের উৎপাদনের পরিমান হ্রাস পায় ০.৪১% এবং বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমান ০.০৪% বৃদ্ধি পায়।[২৫]

১৯৪৭ সালে মেদিনীপুর জেলায় গ্রামীণ এলাকায় 'জনঘনত্ব' ছিল প্রতি বর্গ কি.মি. তে ২৩০ জন; প্রকৃত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৬৬.২১% এবং জমিতে একের বেশি চাষাবাদ হয়েছে ৬.৬২%; মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮০৬.১ হাজার মেট্রিক টন, আউস, আমন ও বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮.৭, ৭৭১.৪ ও ৬ হাজার মেট্রিক টন।[২৬] ১৯৫১ সালে মেদিনীপুর জেলায় গ্রামীণ এলাকায় জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কি.মি. তে ২২৮ জন; প্রকৃত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৬৯.৫৪% এবং জমিতে একের বেশি চাষাবাদ হয়েছে ৪.৬৫%; মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮৮৩.৫ হাজার মেট্রিক টন, আউস, আমন ও বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭.৫, ৮৪৫.৩ ও ০.৭ হাজার মেট্রিক টন।[২৭]

১৯৫৫ সালে প্রকৃত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৬৭.৩০% এবং জমিতে একের বেশি চাষাবাদ হয়েছে ৫.৬৭%; মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮২৯.৪ হাজার মেট্রিক টন, আউস, আমন ও বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪.৫, ৭৯৩.৩ ও ১.৬ হাজার মেট্রিক টন।[২৮]

এ থেকে পরিষ্কার যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কৃষি উৎপাদনের ধন্বাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। নিও মালথুসিয়ান তত্ত্বানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে জমির উপর মনুষ্য চাপ পড়ে এবং মানুষের সঞ্চয় কমে যায়; দুর্ভিক্ষ ও মহমারী ঘটলে এই জমির উপর চাপের ভারসাম্য আসে। এর বিপক্ষে সাম্প্রতিক গবেষকগণ দাবী করেন জমির উপর চাপ বাড়লে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানুষ বিকল্প পদ্ধতি যেমন সেচ ব্যবস্থা, উন্নতমানের বীজের ব্যবহার এবং রাসায়নিক সারের প্রয়োগ প্রভৃতি প্রযুক্তিগত কৌশল গ্রহণ করে। জাপান, আমেরিকার মতো দেশগুলিতে এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এবং প্রাদেশিক ও মেদিনীপুরের মতো আঞ্চলিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সেচ, বীজ এবং সারের ব্যবহারের ফলে জনসংখ্যার চাহিদামতো উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি ঘটেনি তেমনি উৎপাদন বৃদ্ধি না ঘটার পিছনে গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় প্রভাবশালী শ্রেণির প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে অনীহাও পরিলক্ষিত হয়েছিল। ১৯৫১ সালে মেদিনীপুরে সেচ সহযোগী যন্ত্র হিসেবে ডিজেল পাম্পের সংখ্যা ছিল ১৭৫টি, তা ১৯৫৫ তে বেড়ে হয় ৪১৪টি; ১৯৫১ সালে ৩৫৮৩ টি ডোঙা দিয়ে জমি চাষাবাদ হয়েছে, ১৯৫৫ সালে ৪২২২ টি ডোঙা ব্যবহৃত হয়েছে চাষের কাজে।[২৯] সুতরাং এই জেলায় জলসেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা বোরো ধানের চাষাবাদে বিঘ্নিত হয়েছে। এছাড়াও এই শ্রেণি সরকারী নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তাই এই সময়কালে মেদিনীপুর জেলাটিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় অধিক ফসল উৎপাদিত হয়েও উৎপন্ন ফসলের অসম বন্টন এবং প্রযুক্তিগত অপ্রতুলতার কারণে খাদ্য সংকট দেখা দেয়।

অমর্ত সেন এক্ষেত্রে কৃষকদের দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি আন্তসম্পর্ক আছে বলে দাবি করেন।[৩০] কিন্তু এর বিপরীতে পরবর্তী গবেষকরা দাবী করেন, ছোটো খামারে বেশি শ্রম দেওয়া দক্ষতার থেকে দারিদ্র্যতার লক্ষণ বেশি বোঝায়।[৩১] জেমস বয়েস মনে করেন, ছোটো খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় পারিবারিক শ্রমের বিনিময়ে আবার শ্রমের তীব্রতা দারিদ্র্যতা ও দক্ষতার উভয় কারনে হতে পারে বনে মনে করেন।[৩২] মেদিনীপুর জেলায় পারিবারিক শ্রমে কৃষিকাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই শ্রম 'বিনিময় পদ্ধতিতে' প্রচলিত ছিল। প্রধান কৃষিজ ফসলের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলগুলির তুলনায় বেশি হলেও এই জেলার বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমায় বসবাস করেছিল। পারিবারিক ক্ষেত্রে খাদ্যসংকট তীব্র মাত্রায় ছিল। কৃষক হয়তো দক্ষতার সাথে চাষাবাদ করতো, কিন্তু ফসলের বেশিরভাগ অংশ মালিককে শর্ত অনুযায়ী ভাগে দেওয়ার ফলে তাদের বাকি অংশ তেমন থাকতো না। অর্থাৎ একদিকে ভাগচাষীদের বেশি উৎপাদনের প্রতি অনীহা এবং অন্যদিকে উৎপাদনের বৈষম্যমূলক বন্টনব্যবস্থার কারণে এই জেলায় খাদ্যসংকট হ্রাস পায়নি।

কৃষিকাঠামোর পরিবর্তন: রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত আইনি প্রয়াস:

কৃষি কাঠামো বলতে বোঝায় জমি ব্যবহারের অধিকার বণ্টনের নিয়ম। অর্থাৎ এটি কৃষি উৎপাদনের কার্যকারিতা এবং উন্নয়নের গতিকে নির্ধারণ করে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের(১৭৯৩) ফলে বাংলায় এমন এক শ্রেণির উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল যাদের জমির সঙ্গে কোনো যোগসূত্র ছিল না; আবার ঐতিহ্যগতভাবে যারা জমিতে কৃষিকাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তারাই এই আইনের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছিল। বাংলার কৃষি কাঠামোর নতুন অবয়ব এই বন্দোবস্ত থেকেই সূত্রপাত ঘটে। জমিদারদের শোষণ থেকে রায়তদের সুরক্ষার জন্য সরকার ১৮৫৯ সালে '*Rent act*' এর দ্বারা কোনো রায়ত বারো বছর একটানা একটি

জমিতে চাষাবাদ করলে জমিদার উচ্ছেদ করতে পারবে না; কিন্তু জমিদাররা আইনের ফাঁক দিয়ে রায়তদের তার আগেই অন্য জমিতে স্থানান্তর করে দিত।[৩৩] ব্রিটিশ সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে(১৮৮৫) কোনো রায়ত একটি গ্রামের যেকোনও জমিতে বারো বছর চাষআবাদ করলে তিনি ওই জমির উপর স্থায়ী স্বত্বাধিকার পাবেন।[৩৪] পরবর্তীকালে ১৯২৮ এবং ১৯৩৮ সালের সংশোধনীতে রায়তদের পক্ষে আইন প্রণয়ন হয়। তবে এই সব আইনি ব্যবস্থা কৃষকশ্রেণির সব স্তরের কল্যানে উপযুক্ত হয়নি। ১৯৪০ 'ফ্লাউড কমিশন' মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের উচ্ছেদ করে কৃষকদের সরাসরি সরকারের অধীনে প্রজাস্বত্ব প্রদানের সুপারিশ করে।[৩৫] ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সালের ''West Bengal Estates Acquisition Act, 1953'' পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সমস্ত অধিকার যেমন: জমি, খনি, বন, হাট-বাজার এবং মৎস্য খামারের মালিকানা সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে।[৩৬] এরপর ১৯৫৫ সালে "West Bengal Land Reforms Act" এর মাধ্যমে সরকার রায়ত বা কৃষকদের জমির অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়। জমি হস্তান্তর বা উপ-ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য জনপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা *(Ceiling)* নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, এই আইনে বর্গা প্রথা *(Bargadar system)* নিয়ন্ত্রণ, ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের যৌক্তিক পদ্ধতি এবং সঠিক খতিয়ান *(Records of Rights)* রক্ষণাবেক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়।[৩৭] ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে জমির উপর অধিকার নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গৃহীত আইনগুলি বাংলায় এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমবাংলায় গ্রামীণ কৃষিকাঠামোয় একটি ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

মেদিনীপুর জেলাঃ কৃষিব্যবস্থায় সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস:

১৯১০-৩৭ সালের মধ্যে মেদিনীপুরে জমিদার (Proprietors), পত্তনিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী(Tenure-Holders), প্রজাস্বত্বভোগকারী কৃষক (Raiyats) এবং অধস্তন রায়তদের(Under-Raiyats) জমির মালিকানার অনুপাত [সারণী: ১] পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় জমির উপর মধ্যস্বত্বভোগীর অনুপাত ২০.১৫; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সময়কালে মেদিনীপুরের পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া জেলায় মধ্যস্বত্বভোগীর অনুপাত (৪২.৫২) তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির থেকে বেশি।[৩৮]

জমির মালিক [Land Hoders]	**অনুপাত** [proportion]
জমিদার(Proprietors)	**১০.৭১**
পত্তনিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী(Tenure-Holders)	**২০.১৫**
প্রজাস্বত্বভোগকারী কৃষক(Raiyats)	**৬৫.৭৮**
অধস্তন কৃষক(Under-Raiyats)	**৩.৩৬**

[সারনী: ১ ঔপনিবেশিক পর্বে কৃষিকাঠামো]

১৯২০ এর দশক থেকে মেদিনীপুরে *'কুলাক'*[৩৯] বা *'জোতদার'* নামে এক ধনী কৃষক শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল যারা গরীব কৃষকদের ঋণের অনাদায়ে জমি কেড়ে নিত; এরাই ধানের গোলা ও শস্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৪০] ইউনিয়ন বোর্ডের বাড়তি করের বিরুদ্ধে ধনী জোতদার কৃষকশ্রেণীর সফল সংগঠিত আন্দোলন শুধু ব্রিটিশ বিরোধী ছিল না, স্থানীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।[৪১] এই সময় থেকে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে উল্লম্ব সম্পর্কের উদীয়মান বৈষম্যের কারণে আভ্যন্তরীণ বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব সমঝোতার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধতার প্রতি আদর্শগতভাবে জোর দিয়েছিল।[৪২] এই

সংঘাত প্রধানত ছিল জোতদার-মহাজন-বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঋণগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভাগচাষীদের সমন্বয় শ্রেণীর।[৪৩] ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণের অনাদায়ে ১৯৩০ এর দশক থেকে ভূমি বিক্রি বা হস্তান্তরের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়[সারণী: ২]। ১৯৩০-৩৮ সালের মধ্যে জমি বিক্রির হার ১৬.৮৬%।[৪৪]

১৯৫১ সালের জনগনণা পরিসংখ্যানের হিসেব অনুযায়ী ০-৩৪ একর বা তার বেশি জমির মোট মালিক ছিল ৪.১৯ লাখ; এদের মধ্যে ৩.৩৯ লাখ মালিক তাদের জমিতে ভাগচাষি নিয়োগ না করে নিজেরা বা মজুর দিয়ে জমি চাষ করত। বাকি ৮০ হাজার মালিক তাদের জমির পুরোটা বা কিছুটা ভাগচাষিদের দিয়ে চাষ করাত। উল্লেখ্য যে, মাত্র ১৪৪১ জন মালিক ২০-৩৪ একর বা তার বেশি জমি ভাগচাষিদের দিয়ে চাষ করাত। এছাড়াও যারা যাদের কোন জমি নেই, অন্যের জমিতে মজুরির ভিত্তিতে কাজ করত 'ক্ষেতমজুর' শ্রেণি ছিল।[৪৫] ১৯৫১ সালের জনগনণা পরিসংখ্যানে ০-১.০ একর জমির জমির মালিকের ৮১.৮২% মালিক নিজের জমিতে শ্রমের বিনিময়ে চাষাবাদ করে এবং ২০.০০-৩৪.০০ একর জমির জমির মালিকের ৩৫.৬৭% মালিক নিজের জমিতে বর্গাদার নিয়োগ করেছিল [সারনী: ৩]।[৪৬] অর্থাৎ জমিতে জোতদারদের থেকে ক্ষুদ্র চাষী ও বর্গাদারদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

জমির পরিমাণ [একর]	**মোট জমির মালিকের সংখ্যা**	**মোট জমির মালিকের সংখ্যা যারা কোন বর্গাদার দিয়ে চাষ করত না [%]**	**মোট জমির মালিকের সংখ্যা যারা বর্গাদার দিয়ে চাষ করত [%]**
০-১.০০	৯৪,১৯১	৮১.৮২	১৮.১৮
১.০০-৫.০০	২১৮,০৬৭	৮৩.৭৮	১৬.২২
৫.০০-১০.০০	৭৭,৮৫৭	৭৫.৮৫	২৪.১৫
১০.০০-২০.০০	১৫,৬৭৯	৭৮.৩২	২১.৬৮
২০.০০-৩৪.০০	১৩,১৪৭	৬৪.৩৩	৩৫.৬৭

[সারণী: ৩]

১৯৫৩ সালের বর্গাদার আইনের দ্বারা বর্গাদার উচ্ছেদ রদ এবং মোট উৎপাদনের তিন ভাগের দুই ভাগ ভাগচাষীরা পাবে নির্দিষ্ট করা হয়; কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। প্রভাস চন্দ্র রায় ২৩ মার্চ, ১৯৫৪ সালে বিধানসভায় বলেন, বর্গাদার আইন মোতাবেক তিন ভাগের দুই ভাগ(তেভাগা) ভাগচাষীরা পায়নি; সমাধানের জন্য বোর্ডের কাছে আপিল করলে তা যদি জমিনদার-জোতদারদের বিপক্ষে রায় বেরোয় তারা চাষীদের ধান লুট করে নিয়ে যায়; ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার চার নম্বর ইউনিয়নে ১৫৮টি আপিলের দরখাস্তের মধ্যে ১৩৫টি জমিনদার-জোতদারদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে।[৪৭] গ্রামীণ ক্ষমতাশীল শ্রেণি নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। এই চিত্র শুধু মেদিনীপুরে নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলায় গ্রামীণ ক্ষমতাশীল শ্রেণি নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে আটকে দেয়; এর ফলে কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তা বাস্তবায়িত হয় নি।[৪৮] তাই জমিদার-জোতদারদের ক্ষমতার বিপক্ষে বামপন্থী ধারায় ক্ষদ্র কৃষক ও ভাগচাষীদের সাংগঠনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এই জেলায় শুরু হয়।

কৃষিনির্ভর সামাজিক কাঠামোয় গ্রামীণ এলাকায় উচ্চকোটি শ্রেণির প্রভাবের ফলে রাষ্ট্র কর্তৃক আইনাণুগ ব্যবস্থা, উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া সত্ত্বেও প্রান্তিক শ্রেণির কৃষকদের দূর্দশা মোচন ঘটেনি। কায়েমী স্বার্থ চরিত্র খাজনা

আদায় থেকে বদলে গিয়ে বাজার ভিত্তিক ব্যবসায়ে মুনাফালাভে কৌশলকে বেছে নিয়েছিল। তাছাড়াও রাজনৈতিক পরিসরে স্থানীয় স্তরে এরা প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে প্রান্তিক শ্রেণির কৃষকেরা উল্লম্ব লেনদেনের[৪৯] চাপে বাজার কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া পারস্পারিক সম্মতি অর্থাৎ অসম লাভে অভাবের তাড়নায় কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হত। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের শুরু থেকেই গ্রামীণ সামজে স্বার্থগত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য এমনই কৃষিভিত্তিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটেছিল। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়ন, নীতিসমূহ দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তা জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত চাষীদের সমস্যার সমাধান হয়নি। তবে ঔপনিবেশিক পর্বে গড়ে ওঠা কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর প্রভাব স্বাধীনতার পরেও প্রবলভাবে থাকায় সরকার সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে(যাতে সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণি সংঘাত না ঘটে) সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৪৭-৫৫ সালের মধ্যে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি মুলত জীবিকা নির্ভর ছিল- প্রান্তিক শ্রেণির কাছে মুনাফার থেকে বেঁচে থাকাটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কৃষি পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পর্বের ধারাবাহিকতা মেদিনীপুরের বেশির ভাগ অংশে প্রচলিত ছিল।

তথ্যসূত্র:

১. West Bengal State Statistical Bureau. Statistical Abstract of West Bengal. 1949, no. 3, Govt. Press, 1952, Alipore Table-1.2, p. 14.

২. ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫০, কলিকাতা, পৃ. ৩৩৯।

৩. তদেব, পৃ. ৩৩৮।

৪. তদেব, পৃ. ৩৩৬।

৫. তদেব, পৃ. ৩৩৭-৩৮।

৬. Statistical Abstract of West Bengal. 1956. West Bengal State Statistical Bureau. Govt. Press, 1958, Alipore, pp.66-68.

৭. Government of India. Census of India, 1931. Vol. V: Bengal. Government Press, 1933, Calcutta.

৮. O'Malley, L. S. S. Bengal District Gazetteers: Midnapore. Bengal Secretariat Book Depot, 1911, Calcutta, p. 58.

৯. Chatterjee, Partha. The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism. OUP.,1997, Delhi, p. 66.

১০. Datta, Prabhat Kumar, Land Reforms Administration in West Bengal. Daya Publishing House, 1988, Delhi, pp. 2-3.

১১. Chatterjee, D. P. The West Bengal Land Reforms Act, 1955 (Act X of 1956): Containing All Amendments & Rules. Law Book Stall, 1980, Calcutta, pp. xvi-xvii.

১২. O'Malley, L. S. S. op. cit., p. 84.

১৩. Ibid.

১৪. Mitra, A. District Census Handbook: Midnapur, Census of India, 1951, West Bengal Govt. Press, 1953, Alipore, p. cxxvi.

১৫. Ibid.

১৬. Ibid.

১৭. Ibid.
১৮. L. S. S. O'Malley, op. cit., p. 85.
১৯. Mitra, A. op. cit., p. cxxvi.
২০. Statistical Abstract of West Bengal. 1950, West Bengal State Statistical Bureau. Govt. Press, 1953, Alipore, pp. 116-117.; Statistical Abstract of West Bengal. 1956, op. cit., p. 147-150.
২১. Statistical Abstract of West Bengal. 1956, Ibid. pp. 162-175.
২২. Ibid.
২৩. Ibid.
২৪. West Bengal State Statistical Bureau. Statistical Abstract of West Bengal. 1956, Govt. Press, 1958, Alipore, pp. 180-188.
২৫. Ibid.
২৬. Ibid.
২৭. Statistical Abstract of West Bengal. 1956, Govt. Press, 1958, Alipore, pp. 147-150.; Mitra, A. District Census Handbook: Midnapur, 1951, op. cit., p. 30.
২৮. Statistical Abstract of West Bengal. 1956, op. cit., pp. 180-188.
২৯. West Bengal State Statistical Bureau. Statistical Abstract of West Bengal, 1962, Govt. Press, 1964, Alipore, p. 202.
৩০. Sen, Amartya Kumar. An Aspect of Indian Agriculture. Economic Weekly 14, no. 4-6 (January 27, 1962): 243–46.
৩১. Chattopadhyay, Manabendu and Rudra, Ashok. "Size-productivity Revisited. Economic and Political Weekly 11, no. 39 (September 25, 1976): A104–16.
৩২. Boyce, James K. Agrarian Impasse in Bengal: Institutional Constraints to Technological Change. Oxford University Press, 1987, Oxford, p. 38.
৩৩. Chatterjee, D. P. The West Bengal Land Reforms Act, 1955 (Act X of 1956): Containing All Amendments & Rules, Law Book Stall, 1980, Calcutta, pp. xiii-xiv.
৩৪. Ibid.
৩৫. Ibid., p. xv.
৩৬. Ibid., p. xvi.
৩৭. Ibid., pp. xvi-xvii.
৩৮. Partha Chatterjee. cit., p. 50, [Table no. 4.2].
৩৯. 'কুলাক' শব্দটি রুশ শব্দ যার অর্থ 'মুষ্টিবদ্ধ'। মূলত ৮ একর জমির মালিককে 'কুলাক' শ্রেণির কৃষক বলা হয়। https://en.wikipedia.org/wiki/Kulak. কমিউনিষ্টরা বাংলার 'জোতদার' শ্রেণিকে চিহ্নিত করতে 'কুলাক' শব্দটি ব্যবহার করেন। মেদিনীপুর জেলায় স্থানীয় ক্ষেত্রে 'কুলাক' শব্দটি প্রচলিত ছিল না।
৪০. Ibid., p. 55.
৪১. Sugata Bose, Agrarian Bengal: Economy, Social Structure, and Politics, 1919–1947 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 236-37.
৪২. Ibid., p. 240-42.
৪৩. Partha Chatterjee, op. cit., p. 56.

৪৪. Ibid., p. 62, [Table no. 4.3]

৪৫. Mitra, A. op. cit., p. 164, [Table no. 3.1].

৪৬. Ibid.

৪৭. Assembly Proceedings: Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Ninth Session, 15 February–6 April, 1954, no. 3 (Alipore: West Bengal Press, 1954), pp. 53-54.

৪৮. Boyce, James K. Agrarian Impasse in Bengal: op. cit., p. 254.

৪৯. Barbara Harriss-White. Agricultural Growth and the Structure and Relations of Agricultural Markets in West Bengal. in Sonar Bangla? Agricultural Growth and Agrarian Change in West Bengal and Bangladesh, ed. Ben Rogaly, Barbara Harriss-White, and Sugata Bose, Sage Publications, 1999, New Delhi, p. 382.